সূচীপত্র

অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর মুখোমুখি

১৯৬৫ সালে প্রথম গিয়েছিলেন সুন্দরবনে তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নিরলস গবেষণা চলছে। ৮২ বছর বয়সেও তিনি অক্লান্ত। প্রবাদপ্রতিম প্রবীন অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব।

অচিরাচরিত কথা

গোসাবায় বন্ধ হয়ে গেল কাঠ নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। কীভাবে শুরু হয়েছিল এই সমবায় ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পথচলা। সচিত্র বিবরণ প্রসেনজিৎ কোলের কলমে।

সুন্দরবনের মাছ-কাঁকড়া শিকারে নিষেধের বেড়া

দীর্ঘদিন সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারীদের নিয়ে কাজ করছেন শঙ্করকুমার প্রামাণিক। এবারের লেখায় তুলে ধরেছেন কীভাবে সরকারী নিয়মের বেড়াজালে বিপন্ন দরিদ্র মাছ কাঁকড়া শিকারীরা।

সুন্দরবনের কৃষি ঃ অভিজ্ঞতার নিরিখে

সুন্দরবনের কৃষির প্রধান সমস্যাগুলির মূলে পৌঁছে তার সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম প্রকল্প অধিকর্তা এবং সুন্দরবনের ভূমিপুত্র সুভাষচন্দ্র আচার্য্য।

হাতুড়ে ডাক্তার

আধুনিক চিকিৎসা থেকে বহুদূরে থাকা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষের বল ভরসা এই হাতুড়ে ডাক্তাররাই। সাম্প্রতিককালে করা সমীক্ষার নিরিখে এঁদের সামাজিক অবস্থানের কথা জানালেন নীলাঞ্জন পাত্র।

অনুজার প্রত্যাশা

দারিদ্র তার মুখের গান, কলমের কবিতা কেড়ে নিতে পারেনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সন্তানের লালনপালন তাকে আরও সৃষ্টিশীল করেছে। সুন্দরবনে থেকে মেয়েদের নিয়ে একটি বনবিবি পালা গানের দল তৈরি করা এক লড়াকু নারীর জীবনের গল্প শোনালেন সোমা মুখোপাধ্যায়।

আর যা আছে

পাঠকের চোখে ৫
সুন্দরবনে এক বহিরাগতের রোজনামচা ঃ শিশির চ্যাটার্জী ৩৫
নারায়ণী ঃ সুভাষ মিস্ত্রী ৩৯
নতুন চর ঃ অরুণ কুমার দত্ত ৪১
সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জী ৪২
বাঘে-মানুষে ঃ তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৪৬

তিনটি ধারাবাহিক

আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল ২৫
সুন্দরবনের জার্নাল ঃ প্রণবেশ সান্যাল ২৯
বাংলাদেশের বাদাবন বলছি ঃ সুরেশ কুণ্ডু ৩৭

নামাঙ্কন ঃ সুন্দরবন দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ ঃ চরঘেরির চরে নিজস্ব ছবি

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

ছবি ঃ নিজস্ব

ভারতে যে সব জীব বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে অমলেশ চৌধুরীর নাম প্রথম সারির প্রথম দিকে থাকবে। ১৯৬৫-তে প্রথমবার সুন্দরবনে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আজও সুন্দরবনের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। রাজ্য, কেন্দ্রীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বহু উচ্চ পর্যায়ের কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন এবং করছেন। ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীর যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভ আছে সেখানেই গেছেন এবং থেকে গবেষণা করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চল নিয়ে তাঁর পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যপ্রণালী। এখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাণিবিদ্যার যত প্রবীন অধ্যাপক, গবেষক বা আধিকারিক আছেন তাঁদের প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র। সাগরে তাঁর মায়ের নামে তৈরি করা ইনস্টিটিউট-এ এখনও কাজ করছেন বহু গবেষক। সুন্দরবন অন্তপ্রাণ বিরাশি বছরের এই প্রাণ চঞ্চল গবেষকের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমাদের পত্রিকার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের। সাক্ষাৎকারের চিরাচরিত ভঙ্গীতে কথা বার্তা শুরু করলেও অচিরেই দেখা গেল কাজ পাগল আত্মমগ্ন অধ্যাপক নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে চলেছেন ফলে আমাদের প্রশ্ন করার প্রয়োজন প্রায় রইলোই না। সাক্ষাৎকার প্রকাশের সময়ও আমরা তাই প্রশ্ন-উত্তরের চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করলাম না, কথা ছিল ঘন্টাখানেক থাকার সুযোগ পাব কিন্তু কথা বলতে বলতে পেরিয়ে গেল ঘন্টা চারেক। প্রবীণ অধ্যাপক কখনও বলেছেন তাঁর সুন্দরবনে কাজ করার অভিজ্ঞতা, কখনও তাঁর ছেলেবেলা বা ছাত্রজীবনের কথা। আগামী প্রজন্মের কাছে প্রতিটি প্রসঙ্গই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমাদের। তাই দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি কয়েকটি পর্বে প্রকাশের পরিকল্পনা করা হল। যেভাবে কথা এগিয়েছে সে ভাবেই পরপর প্রকাশ করা হল। 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' এই প্রবীণ অধ্যাপক গবেষককের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি গ্রামে পেঁয়াজ চাষ। ছবি ঃ লেখক।

সুন্দরবনের কৃষি ঃ অভিজ্ঞতার নিরিখে

সুভাষচন্দ্র আচার্য্য

সুন্দরবনের কৃষির সমস্যা ও সমাধানে নানা গবেষণা ও ক্ষেত্রীয় স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং সেগুলি এখনো চলছে। সরকারি ও অসরকারিভাবে তৃণমূলস্তরে যে পরীক্ষা হয়ে চলেছে এবং যে সব কর্ম পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে তা এই অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের অবস্থানের সদর্থক পরিবর্তনের দাবি করতেই পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে তত্ত্বগত বা পুঁথিগত ভাবনা অনুসরণ করে সুন্দরবনের কৃষি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ এখন প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করা যাচ্ছে না। এই এলাকার মাটি, জল, অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য, ফসল বৈচিত্র্য, কৃষিতে বিনিয়োগ, বিক্রী ও রপ্তানীর সুযোগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাবন্ধিকগণের সামগ্রিক এবং বাস্তব ধারণার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুন্দরবনের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপের অধিবাসী এবং সুন্দরবন উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি সরকারি দফতরে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে-এ প্রসঙ্গে অর্জিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই মনে করেন, সুন্দরবনের কৃষির মূল সমস্যা-এই এলাকার মাটির লবণাক্ততা। আবার অনেকে এর সঙ্গে মাটির অম্লতাকেও কমবেশি দায়ী করেন। কিন্তু সুন্দরবনের কৃষিযোগ্য তিন লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে যে ধরণের চাষবাস হয়ে চলেছে তাতে এই সমস্যার কারণে কৃষক খুবই ক্ষতিগ্রস্ত তা বলা যায় না। কেননা সুন্দরবনের চাষযোগ্য জমির প্রায় একশতভাগেই বৃষ্টি নির্ভর আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে।

দয়াপুর গ্রামের একটি ঔষধের দোকান, যেখানে চিকিৎসাও করা হয়। ছবি ঃ শুভদীপ অধিকারী

হাতুড়ে ডাক্তার ঃ শয়তান না ভগবান

নীলাঞ্জন পাত্র

হাতুড়ে চিকিৎসকদের সমান্তরাল বাজার ঃ

বিশ্বের যেকোন উন্নয়নশীল দেশেই সরকারী স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো যথেষ্ঠ দুর্বল। আর সেই সুযোগে ঐ সব দেশে হাতুড়ে ডাক্তারদের রমরমা বাজার। মূলতঃ গ্রামের বেকার যুবক, ওঝা, ঔষধের দোকানদার ইত্যাদি যারা কোন প্রকার অনুমতি পত্র ছাড়াই আধুনিক অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসা করেন তাদের হাতুড়ে ডাক্তার বলা হয়।

ভারতবর্ষও এর ব্যাতিক্রম নয়। গ্রামীণ ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারই চিকিৎসার জন্য বেসরকারী ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীল (জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৫-০৬)। গবেষকদের মতে এই বেসরকারী ডাক্তারদের একটা বড় অংশই হাতুড়ে ডাক্তার। ভারতে এই হাতুড়ে ডাক্তারদের সংখ্যা প্রায় ৫-১৩ লক্ষ।

কারা এই হাতুড়েদের কাছে যায় ঃ

সুন্দরবনের ওপর FHS-IIHMR এর ২০০৯ এ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৬৪শতাংশ মানুষ চিকিৎসার জন্য এদের কাছে গিয়েছেন। ২০১২ সালের FHS-IIHMRএর পাথরপ্রতিমা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুদের চিকিৎসার ৮৫ শতাংশই হাতুড়ে ডাক্তাররা করেছেন। তুলনামূলকভাবে গরীব মানুষেরা এদের উপর বেশি নির্ভরশীল। শিশুদের অসুস্থতার ক্ষেত্রে মাত্র ৫ শতাংশই সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর মানুষের নির্ভরতা বেশি দূরবর্তী সুন্দরবনে, দক্ষিণ সুন্দরবনে ও দ্বীপাঞ্চল সুন্দরবনে।

কেন মানুষ হাতুড়েদের কাছে যায় ঃ

সদ্য প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রের মতে চাহিদার তাগিদে মানুষ

সাইমারির চরে তেল দূষণের ফলে মৃত অলিভ রিডলে কচ্ছপ। ছবি ঃ লেখক।

সুন্দরবনের জার্নাল

প্রণবেশ সান্যাল

ক্যানিং এ অফিস করার সময় দেখেছিলাম যে বেশির ভাগ কর্মী ট্রেনে করে আসতো, তার ফলে অফিসে ১০টার সময় সবাই হাজির। ট্রেন কদাচিৎ একটু দেরী করতো। অন্য অফিসগুলোরও একই অবস্থা, ১০টার গাড়ি যেন শহরকে জাগিয়ে তুলতো। সেবার এক শীতে অফিসে ঢুকেই দেখি বন্ধুমহল ক্লাবের ছেলেরা বসে আছে। তারা জানাল যে কয়েক দিন হল স্টেশনে খুব সামুদ্রিক কচ্ছপের আমদানী হচ্ছে, এরা তো বিলুপ্তপ্রায়, তাই কি করে আটকানো যায়। আমি একজন বনরক্ষীকে ঠিক করে দিলাম ঐ ছেলেদের সাথে নিয়ে ব্যাপারটা বন্ধ করতে। ছেলেরা খুব উৎসাহিত হল এবং অচিরেই কচ্ছপের ক্যানিং আসা বন্ধ হল। ঐ সময় একদিন ২৪ পরগনা বন বিভাগের এ.এফ.ও মদন ভৌমিক সাহেব এলেন আমার অফিসে, বললেন তাঁর কাছে খবর আছে যে প্রচুর রিডলে কচ্ছপের আগমন হচ্ছে কলসের কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। আমি আর উনি যদি দ্বীপটা খুঁজে বের করি এবং অলিভ রিডলে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে এনে বাচ্চা ফোটাই।

আসলে রিডলে কচ্ছপের অনেক শত্রু, ডিম পাড়তে আসা মাকে প্রায়শঃই ধরে নিয়ে এসে, মাংস খাওয়ার জন্যে বাজারে বিক্রি করা হয়। ডিমগুলো খেতে আসে বন্য শুয়র, গোসাপ, কখনো জেলেরা। বাচ্চা বেরোনর পর তারা যখন সমুদ্রের দিকে ছুটতে থাকে তখন তাড়া করে সামুদ্রিক চিলরা। এরপর জলের মধ্যেও তারা কিছু কিছু হাঙরের পেটে যায়। শেষমেশ শতকরা এক ভাগ বাঁচে। এই জন্যেই দরকার ডিম সংগ্রহ করে বাচ্চা ফুটিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া।